Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 373 - 391
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্র ভাবনায় উনিশ শতকের কয়েকজন বরণীয় ব্যক্তিত্ব : একটি পর্যালোচনা

উষ্ণীষ পতি
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: patiushnis@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Nineteenth Century, Bengal, Debendranath Tagore, Akshay Kumar Datta, Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Sister Nivedita,

Abstract
According to Shivnath Shastri, the period from 1856 A.D to 1861 A.D was an auspicious time for Bengal. During this time, the widow marriage revolution, Indian Mutiny, Indigo Movement, the demise of Ishwar Chandra Gupta, and the appearance of Madhusudan, among other incidents, occurred.

During this period, a drastic change occurred in socio-cultural, political, literary, religious, nationalist, and all aspects of society. The Thakurbari of Jorasanko was the central point of these activities, and it was during this crucial time that Rabindranath was born.

In the 19th century, socio-religious reform movements, literary revolutions, and national movements took place. The pioneers of these three movements, such as Devendranath Thakur, Keshav Chandra Sen, Bankim Chandra Chattopadhyay, and Madhusudan Dutta, have been clearly described in this essay based on Rabindranath Tagore's memoirs, letters, and many other writings.

In addition to this, Rabindranath Tagore's opinions on other elite individuals of different backgrounds have also been described here.

Discussion

এক

"তখন কলিকাতায় খোলা নর্দমা ছিল। চারিদিকেই দুর্গন্ধ। তাহার সহরের যত ময়লা সব গঙ্গায় ফেলা হইত--গঙ্গার জলে সর্বদাই ময়লা ভাসিত; কিন্তু গঙ্গাস্নানের সময় সেই সব ময়লা বা তজ্জনিত দুর্গন্ধ সত্ত্বেও আমাদের চিরদিনের সংস্কারবশত মনে কোনই দ্বিধা হইত না। অভ্যাস ও সংস্কারের এমনি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাহাত্ম্য! সন্ধ্যার প্রারম্ভেই মশক মণ্ডলী মাথার উপর বোঁ বোঁ শব্দে মণ্ডলাকারে নৃত্য সহকারে সংগীত জুড়িয়া দিত...।"[১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ণিত এই কলকাতা শহরে জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসন বাড়িতে ১২৬৮ বঙ্গাব্দে ২৫ বৈশাখ সোমবার (ইংরেজি মতে ৭মে ১৮৬১ খ্রি.মঙ্গলবার) রবীন্দ্রনাথ জন্ম-গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ও সারদা দেবীর চতুর্দশ সন্তান তথা অষ্টম পুত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার আর পাঁচটা সাধারণ পরিবারের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। সম্পদ, সামাজিক সম্মান, সাহিত্য চর্চায় আর্টে ঠাকুরবাড়ি উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের হয়ে ওঠার পেছনে তার পারিবারিক পরিবেশের পাশাপাশি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবও অনস্বীকার্য। লক্ষ্য করার বিষয় রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগ-সন্ধিক্ষণ হিসাবে বিবেচিত।[২] বাংলায় ইংরেজ শাসনের শতবর্ষ-পূর্তির বছরেই সিপাহী বিদ্রোহের প্রয়াস কে রাজনৈতিক দিক থেকে একটা যুগের অন্ত বলা যায় যায়। এই বিদ্রোহের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ১৮৫৮ সালে বাংলা তথা ভারতের শাসনভার চলে যায় চলে যায় মহারানি ভিক্টোরিয়ার হাতে অর্থাৎ কোম্পানির শাসনের অবসানে পার্লামেন্টারিয়ান শাসনের সূচনা ঘটল। সুশাসনের অজুহাতে ভারতীয়দের দৃঢ়তর শাসন জালে বেঁধে রাখার জন্য প্রণয়ন হতে থাকলো নানা ধরনের বিধি-বিধান। রাজস্ব ও আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা, হাইকোর্ট স্থাপন, ভারত সম্পর্কীয় নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি রেলপথ ও সুয়েজ খাল খনন বিদেশি বাণিজ্যের পথ খুলে দিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার পাশাপাশি নানা ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন বাঙালি চিত্তকে নাড়া দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন –

> "১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মহেন্দ্রক্ষন বললে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহ আন্দোলন, ইন্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশ এর অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যলয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশব চন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তি সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে আলোচনার যোগ্য।"[৩]

এক যুগের আবসানের পর আর এক যুগের আবির্ভাবের ফলে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, জাতীয়তাবোধ তথা সর্বক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে সেই নবচেতনার মিলনক্ষেত্র বলা যায়। রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্রে পারিবারিক তথা সামগ্রিক পরিবেশের প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি তৎকালীন নানা ঘটনাবলী, বহু বিশিষ্টজনের চিন্তা ও চেতনার অভিঘাত বিশেষ অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে। কেউ হয়ে উঠেছেন পরম বন্ধু। কেউ বা সমালোচক। পাশাপাশি তিনি নিজেও অন্যের প্রেরণার কারণ হয়ে উঠেছেন। উনিশ শতকের বহু বরেণ্য মানুষকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২খ্রি.), 'ছেলেবেলা' (১৯৪০খ্রি.), 'আত্মপরিচয়' (১৩৫০খ্রি.) প্রভৃতি স্মৃতিমূলক জীবনকথায় (memoir) এবং অন্যান্য রচনা ও চিঠিপত্রে স্মরণ করেছেন। সেই সমস্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমরা রবীন্দ্র দৃষ্টিতে তৎকালীন বরেণ্য জনকে দেখার চেষ্টা করব।

দুই

উনিশ শতকে প্রগতিশীল ভারতীয়রা পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে যুক্তি ও মানবতার আলোকে স্বদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার গুলিকে বিচার করতে চাইলেন। চাইলেন প্রচলিত কুসংস্কার আচ্ছন্ন ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের বেড়াজাল থেকে ভারতীয়দের উদ্ধার করতে। সেই সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথের চোখে তিনি 'ভারতের নবযুগের প্রবর্তক'।[৪] বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথের রামমোহন বিষয়ক লেখা গুলি 'ভারত পথিক রামমোহন রায়' (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধ গুলিতে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন ভারতবর্ষের ভূ-সংস্থানের মধ্যে ঐক্য থাকলেও আচারে, বিচারে, ধর্মে, ভাষায় ভারতবর্ষ পদে পদে খণ্ডিত। তারা পাশাপাশি বসবাস করলেও মিলতে চায় না। অন্ধতা, হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ, প্রদেশে প্রদেশে বিচ্ছিন্নতা, হরিজন সমস্যা প্রভৃতি ভারতবর্ষের নিত্যসঙ্গী। এক সময় ইউরোপও একই সমস্যায় জর্জরিত ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিদ্যার প্রভাবে ইংল্যান্ডকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রোটেস্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিকের দ্বন্দ্ব কিছুটা মেটার ফলে বিচ্ছিন্ন ট্রেনের বগীর মতো বহু উপরাষ্ট্রের সমবায়ে তৈরি হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। অন্তরের ঐক্য ভিন্ন রাষ্ট্রীয় ঐক্য অপ্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষের এই দ্বন্দ্বের মাঝেই যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন 'ভারত পথিক'রা। বুদ্ধদেব জাতি-বর্ণ শাস্ত্রের ভেদকে অতিক্রম করে বিশ্ব মৈত্রীর বাণী শুনিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব মেটাতে আবির্ভূত হয়েছেন কবীর, রজ্জাক, নানক ও শ্রীচৈতন্য। তাঁরা 'ঐক্য-তত্ত্বে' বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন 'মিলনের পন্থাই ভারত পন্থা'।[৫] রবীন্দ্রনাথের মতে,

> "এই ভারত পথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তি লাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিককালের রামমোহন রায়।"[৬]

রামমোহন ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ) তৎকালীন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের শৈশবের দেবতা ছিলেন শিব ও বিষ্ণু। শিব ছিলেন তাঁর মাতৃকুলের দেবতা আর পিতৃকুলের দেবতা বিষ্ণু। কিন্তু বালক রামমোহনের পড়াশোনা শুরু হয়েছিল মাদ্রাসায়। বয়স তখন ৯/১০ বছর। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন,

> "বালকটির মনের চোখ খুলে দিয়েছিল আরবি 'মন্তাক' এর মাধ্যমে আসা ইউক্লিডীয় জ্যামিতি, পোরফিরির তর্কবিদ্যার বর্ণ গুলি, রক্তে অনুভূত হচ্ছে কিন্তু সে সময় খুবই আবছা ভাবে বোঝা ফার্সি গজলগুলি।"[৭]

এভাবে তিনি ১৫/১৬ বছর বয়সে পাটনায় ফারসি আরবিতে সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। এই সময় তিনি মুসলমান যুক্তিবাদীদের (অষ্টাদশ শতকের মুতাজিলাদের) এবং মুসলমান একেশ্বরবাদীদের (মুয়াহিনের) ভাবধরার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। আরবি ও ফারসি ভাষা পরিচয় এর কয়েক বছর পর তিনি বারাণসী থেকে সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু দর্শনের শিক্ষা নেন। জৈন শাস্ত্র এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাঙ্গেও পরিচিত হন। এভাবে খুব অল্প বয়সে পাটনা, বারাণসী, নেপাল, তিব্বত পরিভ্রমণ করেন। পাটনাতে থাকার সময় কোরাণ পাঠ করে হিন্দুদের প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা জন্মে। এছাড়া তিব্বতে বৌদ্ধমতালম্বীদের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করতে, তাঁর প্রাণহানীর আশঙ্কা তৈরি হয়।[৮] এ প্রসঙ্গে ১৩২২ সালে ব্রাহ্মণ লাইব্রেরিতে রামমোহন স্মরণ-সভায় রবীন্দ্রনাথের অভিভাষনটি প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন,

> "আমি মনে করি সত্যকে স্বীকার করে রামমোহন তার দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন সেই নিন্দা ও অপমানেই তাঁর মহত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তার গৌরবের মুকুট। লোকে গোপনে তার প্রাণবধের চেষ্টা করেছিল।"[৯]

১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকেই অর্থোপার্জনের জন্য তাঁর কলকাতায় যাওয়া আসা শুরু হয়। রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর প্রভৃতি জায়গায় ইংরেজ সরকারের অধীনে কাজ করার পর কোম্পানির কালেক্টর জন ডিগবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে রংপুরে শেরেস্তাদার বা দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। উত্তরবঙ্গে বাস কালে তিনি অল্পস্বল্প ইংরেজি শেখেন। ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত রামমোহন ডিগবির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে জেনেছিলেন। প্রভাবিত হয়েছিলেন পাশ্চাত্য ভবধারার দ্বারা। মূল বাইবেল পাঠ করবার জন্য গ্রিক ও হিব্রু ভাষাও আয়ত্ত্ব করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি পর্যবেক্ষণ খুব প্রাসঙ্গিক-

> "যিনি প্রাচীনকালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের মতো জীবনের আরাম্ভকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্যবিদ্যা শেখেননি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্যবিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট হয়ে থাকতে পারলেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, এই নির্ভীক সাহসের জন্য তিনি ধন্য।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলার রাজনীতি-বিদ্যাচর্চা-সমাজ সংস্কার-ভাষাচর্চা-র 'পথপ্রদর্শক' হিসেবে রামমোহনকে দেখেছেন। কারণ রামমোহন পিতার মৃত্যুর(১৮০৩ খ্রি.) পর মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে ফারসি ভাষায় রচনা করলেন 'তুহফত্-উল-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মুওয়াদ্দিন' বা 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি'। পাশাপাশি বাংলায় রচনা করেছেন বেদান্তের ভাষ্য এবং ঈশ, কঠ, কেন, মণ্ডুক,মাণ্ডুক্য উপনিষদের বাংলা অনুবাদ। 'তুহফত্-উল-মুওয়াদ্দিন' গ্রন্থে বহুশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ, অলৌকিকতার বিরোধিতা করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এক সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বের কথা বললেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের আধিপত্য এবং ইংরেজি শিক্ষিত আবেগোন্মত্ত যুবকদের হাত থেকে বঙ্গ সমাজকে রক্ষা করেছিলেন রামমোহন। তিনি এক স্বতন্ত্র পথ দেখালেন বাংলাকে। রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখেছেন-

> "কী রাজনীতি কী বিদ্যাশিক্ষা কী সমাজ, কী ভাষা-আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন-কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নব শিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃত গম্য বিস্মৃত প্রায় বেদ-পুরাণ-তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।"[১১]

শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে তিনি এরপর ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন।[১২] কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের গোড়া থেকে পাকাপাকি ভাবে রামমোহন কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। যদিও ১৮১৪ সালেই তিনি দু-খানি বাড়ি কিনেছিলেন। একটি চৌরঙ্গি পাড়ায়, দ্বিতীয়টি মানিকতলায়।[১৩] ঠিক এই সময় বাইশ বছরের ছোট দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। যা পরবর্তীকালে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হলো। ১৮১৫ সালেই একেশ্বরবাদী হিন্দু ধর্ম বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন 'আত্মীয় সভা'। এই সংগঠনের অন্যতম সদস্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। সভাতে হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বক্তব্য শুনে অনেক সদস্য এই সভার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিন্তু দ্বারকানাথ নিষ্ঠাবান মূর্তিপূজক বৈষ্ণব হয়েও এই সব আলোচনায় যোগ দিতেন। এমনকি নিয়মিত উপাসনাতেও থাকতেন। রামমোহনের মূর্তি পূজার বিরহিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সঞ্চয়' (১৯১৬খ্রি.) প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'ধর্মের নব-যুগ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন-

> "তিনি যে সময় ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মূর্তি পূজার মধ্যেই জন্মেছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনমতেই স্বীকার করতে পারলেন না। তাহার কারণ এই তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা--যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধ সকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে...।"[১৪]

দ্বারকানাথ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময়ও প্রিয়বন্ধুকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। রামমোহনের মতো দ্বারকানাথও তো আরবি ফারসি এবং ইংরেজি ভাষা জানতেন। স্বাভাবিকভাবে, দুজনেই ইংরেজি শিক্ষার সুফল গুলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই হিন্দু কলেজ (২০ জুন, ১৮১৭ খ্রি.) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে তাঁরা দু-জনেই সমর্থন জানান। রবীন্দ্রনাথের মতে, রামমোহনের এই বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের মধ্যে দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার যথার্থ সমন্বয় চেয়েছিলেন।[১৫] রামমোহন আত্মীয়সভার কার্যাবলীতে অসন্তুষ্ট হয়ে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসভা গঠন করেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে যা ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত পায়। রামমোহনের মৃত্যুর পর কয়েক বছর দ্বারকানাথের দানের উপর নির্ভর করেই ব্রাহ্মসমাজ টিকে ছিল। রামমোহনের সতীদাহ নিবারণের প্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ, এদেশে প্রথম 'রাষ্ট্র বুদ্ধি'র পরিচয় হিসেবে দেখেছেন। নারী জাতির প্রতি তার বেদনা বোধের কথা সবার জানা। সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথার মাধ্যমে ধর্মের যে অবমাননা চলছিল তা আটকে ছিলেন পৌরুষের অধিকারী রামমোহন।[১৬] এই সময় দ্বারকানাথ বন্ধু রামমোহনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু দ্বারকানাথের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ মৌন।

আনুমানিক ১৮২২ সালে রামমোহন নিজে যখন হেদুয়ার কাছে অ্যাংলো-হিন্দু-স্কুল নামে একটি ইংরেজি স্কুল চালু করলেন তখন দ্বারকানাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে সেই স্কুলে ভর্তি করে দেন। রামমোহনের গাড়িতে(শকট)

চেপে নতুন স্কুলে যাওয়ার গল্প দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন। যা শুনে কল্পনাপ্রবণ বালক রবীন্দ্রনাথের মনে রামমোহনের একটি অপূর্ব মানসী মূর্তি ভেসে উঠেছিল। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন থেকে শুরু করে ছাত্রদের উৎসাহ ভাতা প্রদান, মধুসূদন গুপ্ত (সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদের অধ্যাপক) কে শব ব্যবচ্ছেদের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া এবং নিজ ব্যয়ে ছাত্রদের ডাক্তারি শিক্ষার জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়ার মত জনকল্যাণমূলক কাজ করলেও পিতামহ দ্বারকানাথ সম্পর্কে ইতিবাচক কিছু লেখেননি। সরাসরি কিছু না বললেও দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের দিন 'মহষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষ্যে প্রার্থনা' শীর্ষক বক্তৃতায় পিতামহ দ্বারকনাথের প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি বলেন,

> "আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপর সহসা ঋণ রাশি ভারাক্রান্ত কী দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল তারা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দুস্তর ঋণ সমুদ্র সন্তরণপূর্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, আমাদের অদ্যকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।"[১৭]

প্রায় একই এরকম কথা বলেছেন শান্তিনিকেতনে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকীতে দেওয়া বক্তৃতায় (৬ মাঘ ১৩৪২)। অর্থাৎ পিতা দেবেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করতে গিয়ে, দ্বারকানাথের মৃত্যু পরবর্তী বাণিজ্যিক মন্দার (১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ) ফলে ঠাকুর পরিবারে যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল, সে কথা তুলে ধরেছেন। এবং পিতার প্রতি সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। দ্বারকানাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে। রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লিখেছেন-

> "ভবসিন্ধুবাবু পিতৃদেবের যে জীবনী লিখেছেন তার মধ্যে একটি গল্প আছে যে আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোন্ ঘর আমার ইচ্ছামত ভাঙচুর করাতে পিতৃদেব প্রথমে আমাকে ভর্ৎসনা করেন তার পরে আমার অকীর্ত্তি সংশোধন করে দেন, তার পরে আমাকে বাস করবার জন্য নূতন বাড়ি দেন। যখন সমালোচনা করবে তখন পাঠকদের বোলো আমার নূতন বাড়ির ভিত্তি এই ঘটনার ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তার প্রধান কারণ আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোন কিছুই ভাঙিনি, যা কিছু ক্ষণভঙ্গুর তা তিনি নিজেই একরকম ভেঙে শেষ করে গেছেন, উত্তরবংশীয়ের জন্যে অপেক্ষা করেননি।"[১৮]

সমগ্র 'জীবনস্মৃতি'তে মাত্র একবার 'পিতামহ' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। 'বাংলা শিক্ষার অবসান অধ্যায়' অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "আমাদের বিদ্যালয়ের কোন-একজন শিক্ষক কিশোরীমোহন [কিশোরী চাঁদ] মিত্রের রচিত আমার পিতামহের ইংরেজি জীবনী পড়িতে চাহিয়াছিলেন। আমার সহপাঠী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ সাহসে ভর করিয়া পিতৃদেবের নিকট হইতে সেই বইখানি চাহিতে গিয়াছিল।"[১৯]

কৃষ্ণ কৃপালিনী তাঁর, 'দ্বারকানাথ ঠাকুর: বিস্মৃত পথিকৃৎ' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> "পিতৃস্মৃতির প্রতি মহর্ষির অনীহা আমাদের আরো বেশি আশ্চর্য করে যখন ভাবি যে-রামমোহন রায় মহর্ষির ধর্ম-প্রেরণার প্রধান উৎস স্বরূপ, দ্বারকনাথের প্রতি তাঁর প্রণয় ছিল গভীর। ... দেবেন্দ্রনাথের পিতৃ স্মৃতির প্রতি অনীহা যেন সংক্রমিত হয়েছিল তার এই কনিষ্ঠ পুত্রদের মধ্যে।"[২০]

দেবেন্দ্রনাথকে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হিসাবে তৈরি করার জন্য দ্বারকানাথ তাঁকে ১৮৩৪ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহকারী কোষাধক্ষ্য নিযুক্ত করেন। পরে তাঁকে ওই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও কার ঠাকুর কোম্পানির এক আনা অংশীদারও করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মতিগতি ব্যবসাতে ছিল না। পরবর্তীকালে কার-ঠাকুর কোম্পানির যে অর্ধেক অংশ তাঁর অধিকারে ছিল, তার সবটাই তিনি দেবেন্দ্রনাথকে দিয়ে দেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার কাজে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে বৈষয়িক কাজে বিশেষ মন দিতে পারেননি। প্রথম দিকে দ্বারকানাথ সাত্ত্বিক আহারে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ভোজসভার মদ্য-মাংসে আসক্ত হয়ে পড়েন। স্বামীর এই ভ্রষ্টাচার স্ত্রী দিগম্বরী মেনে নিতে পারেননি। তিনি স্বতন্ত্র থাকার সিদ্ধান্ত নেন। দ্বারকানাথ স্ত্রীর এই ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে বৈঠকখানা বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। অশুচি স্বামীর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সংস্পর্শে এলে সাতঘড়া গঙ্গাজল ঢেলে স্নান করে শুদ্ধ হতেন। সম্ভবত এভাবে স্নান করার ফলে নিউমোনিয়া হয়ে তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে। এই ঘটনা দেবেন্দ্রনাথের মনে প্রভাব ফেলতেও পারে। পিতার কাছ থেকে বা অন্য কোন সূত্রে এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথের জানাও অস্বাভাবিক নয়।

১৮৪৬ সালের ১ আগস্ট লন্ডনের নিকটবর্তী সারেতে ৫২ বছর বয়সে দ্বরকানাথের মৃত্যু হয়। আশ্চর্যের বিষয় রামমোহন ও দ্বারকানাথ দুজনেরই মৃত্যু হল বিদেশে। দুজনেই সমাধিস্থ হলেন বিদেশের মাটিতে। রামমোহন ব্রিটেনে, দ্বারকানাথ লণ্ডনে। দ্বারকানাথ স্টেপলটন গ্রোভ-এর কাছের উদ্যান বাটিকায় সমাহিত রামমোহনের দেহাবশেষ তুলে আর্‌নোস ভেলে একটি সুন্দর সমাধি মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বরকানাথের সমাধিটি বিশেষ যত্ন করে তৈরি করা হয়নি। আই.সি.এস পরীক্ষায় বসতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষ কেনসল গ্রিন সেমেট্রিতে সমাহিত দ্বারকানাথের সমাধিটি দেখে আসেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকবার বিলেতে গেলেও পিতামহের সমাধি দেখতে যাননি। কিংবা তার সংস্কার সাধনের আগ্রহও প্রকাশ করেননি। পিতামহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ মৌন থাকলেও রামমোহনের প্রতি অবিচারে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তার বিভিন্ন লেখায় তার পরিচয় রয়েছে। যেমন-

> (ক) “তাঁকে দেশের বহুজনে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন বলে স্বীকার না করে, তবুও চিরকালের ভারতবর্ষ তাকে গভীর অন্তরে নিশ্চিত স্বীকার করেছে।”[২১]
>
> (খ) “আজও কি রামমোহনকে আমরা শত্রু বলে অসম্মান করতে পারি?... দেশের যথার্থ মহাপুরুষের নামে গৌরব করার অর্থই দেশের ভবিষ্যতের জন্য আশা করা।”[২২]
>
> (ঘ) “যিনি পরম শ্রদ্ধেয়, যেমন মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজও প্রশমিত হয়নি।”[২৩]
>
> (ঙ) “আজ যদি তাঁকে আমরা ভালো করে স্বীকার করতে না পারি, সে আমাদেরই দুর্বলতা। জীবিত কালে তাঁর প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক কাজে আমরা তাঁকে পদে পদে ঠেকিয়েছি।”[২৪]
>
> (চ) “জানি সকলে তাঁকে স্বীকার করবে না এবং অনেকে তাঁকে বিরুদ্ধতার দ্বারা আঘাত করবে।”[২৫]
>
> (ছ) “সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্যাতন করুক, তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেক।”[২৬]

রবীন্দ্রনাথের মতে, রামমোহন আমাদের নির্জীব দেশে মুক্তির বাণী ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে এসেছেন। ‘ভারত পথিক’ রামমোহন ‘বাংলাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রথম দূত’ ছিলেন। তিনি এই ‘নবযুগের উদ্বোধক’। রামমোহনের উদার প্রশস্ত ঐক্যের আহ্বান শুনে দেশকালের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে হিন্দু-মুসলমান খ্রিস্টান একসঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তাই রামমোহনের মৃত্যু শতবর্ষ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-

> “হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
> মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
> মৃত্যু অন্তরাল ভেদি দাও তব অন্তহীন দান
> যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ
> যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
> এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।”[২৭]

রবীন্দ্রনাথ রামমোহন লাইব্রেরিতে আয়োজিত রামমোহন স্মরণ সভায় সভাপতির অভিভাসনে বলেছিলেন,

> “পৃথিবীর অন্য সব মহাপুরুষের মতো তিনি টাকাকড়ি বিদ্যা খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেননি, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই এককে সত্যকেই চেয়েছিলেন।”[২৮]

কিন্তু রামমোহন বা দ্বারকানাথ কেউই টাকা পয়সার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন তা বলা যায় না। কারণ রামমোহন সরকারি চাকরি, জমিদারি, ব্যবসা তথা সুদের কারবারে যথেষ্ট আয় করতেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের সখ্যতা এই ব্যবসা বাণিজ্য সূত্রেই। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বরোকানাথ ঠাকুরের জীবনীতে জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।[২৯] অথচ রামমোহন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "...যেখানে রাজা রামমোহনের মহত্ত্ব তাঁর সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁকে কেউ আট-আনা কেউ বারো-আনা স্বীকার করি তা হলে তাঁর অপমানেই করা হবে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের হয় সম্মান করে ষোল-আনা স্বীকার করতে হবে, না হয় অস্বীকার করে অপমানিত করতে হবে; এর মাঝামাঝি অন্য পথ নেই।"[৩০]

তাঁর মতে সমস্ত বাঙালি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। রামমোহন তাঁর কাজের মাধ্যমে বাঙালিদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। বাঙালি বলে কেউ অবহেলা করলে, তাকে রামমোহনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন।[৩১] বোঝাই যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে বিতর্কে ইতি টেনে রামমোহনকে সমস্ত সমালোচনার উর্ধ্বে স্থাপন করে তাঁর পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। তাই সমালোচকদের মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার দৃষ্টি দিয়েই রামমোহন কে বিচার করেছেন।[৩২]

তিন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর The religion of an artist (1953) গ্রন্থে বলেছেন,

> "I was born in 1861 that is not an important date of history but it belongs to a great in Bengal, when the current of three movements had met in the life of our country. one of these, the religious, was introduced by very great-hearted man of gigantic intelligence, Raja Rammohan Roy. It was revolutionary, for he tried to reopen the channel of spiritual life.[৩৩]

এর পরেই তিনি গর্বের সঙ্গে বলেছেন-

> "...my father was one of the great leaders of that movement, a movement for whose sake he suffered obstracism and braved social indignities."[৩৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'পিতৃদেব', 'হিমালয় যাত্রা', 'প্রত্যাবর্তন' এবং 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধ গুলিতে দেবেন্দ্রনাথের কথা বলেছেন। তাছাড়া 'চরিত্রপূজা'র অন্তর্গত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' শিরোনামে চারটি প্রবন্ধ দেবেন্দ্রনাথকে নিয়েই লেখা। উক্ত লেখাগুলি পরবর্তী কালে 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন লেখায়, বক্তৃতায় বা চিঠিপত্রে দেবেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। সেকালে ঠাকুর পরিবারের ছেলেরা 'ভৃত্য রাজক তন্ত্রে'র মধ্যে বড় হত। তাদের সহ্য করতে হতো ভৃত্তদের নির্মাণ ব্যবহার। ভৃত্যদের হাতে কিল-চড় খাওয়া ছিল নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বারবার স্কুল পরিবর্তন করেছেন। তাঁর কাছে স্কুল 'দশটা-চারটার আন্দামান' (ছেলেবেলা)। স্কুলে শিক্ষকদের 'কুৎসিত ভাষা' সহ্য করতে হত (নর্মাল স্কুল, জীবনস্মৃতি)। বাৎসরিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েও শিক্ষক হরনাথ পন্ডিতের অবিশ্বাসের শিকার হয়েছেন। সহ্য করতে হতো সহপাঠীদের 'দুর্বৃত্ত' ব্যবহার। বিশেষ করে নর্মাল স্কুলের সহপাঠীদের সম্পর্কে 'ঘৃণ্য', 'পাঁক', 'মলিনতা', 'অশুচি' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ (জীবনস্মৃতি)। সে সময় অসুখ-বিসুখ ছাড়া বাবা মায়েদের বিশেষ দেখা যেত না। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, 'আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নেই।"[৩৫] তাছাড়া ,সারদাদেবীর নিত্যসঙ্গী অসুখ। আর বাবা দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জন্মের কয়েক বছর পূর্ব থেকেই আসাম, ব্রহ্মদেশ, কাশি, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লি প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রবাস থেকে কলকাতায় ফিরলে বাড়িতে সাজো সাজো রব পড়ে যেত। একবার সৌমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সত্য প্রকাশ এর উপনয়ন উপলক্ষ্যে দেবেন্দ্রনাথ বাড়িতে এসেছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম মতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। এবার 'স্বভাবভিরু', 'নিরুত্তর', 'স্কুল ছুট' বালকটি দেবেন্দ্রনাথের নজরে পড়ল। হিমালয় যাত্রার জন্য ডাকা হল বালক রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন,

> "পইতা উপলক্ষে মাথা মুড়াইয়া ভয়ানক ভাবনা হইল ইস্কুলে যাইবো কী করিয়া... এমন দুশ্চিন্তার সময়ে একদিন তেতালার ঘরে ডাক পড়িল। পিতা জিজ্ঞাসা করলেন আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাই কি না। 'চাই' এই কথাটি যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়।"[৩৬]

পিতার আদেশে তৈরি পোশাক ও জরির কাজ করা মখমলের টুপি পরে রেলগাড়িতে চড়ে হিমালয় যাত্রা করলেন বালক রবীন্দ্রনাথ। একজন দায়িত্ববান অভিভাবক রূপে দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকার কথা উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের লেখায়-

> (ক) "যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছ বিহারে নিষেধ করিতেন না।"[৩৭]
>
> (খ) "পিতা বোধ করি আমার সাবধানতা বৃত্তির উন্নতি সাধনের জন্য আমার কাছে দুই চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়ির দম দিবার ভার দিলেন । ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে-চিন্তা তিনি করিলেন না।"[৩৮]
>
> (গ) "ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোক গুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কপি করিতে দিয়েছিলেন।"[৩৯]
>
> (ঘ) "পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া Peter parleg's tales পর্যায়ের অনেক গুলি বই লইয়া গিয়েছিলেন।"[৪০]
>
> (ঙ) "আমার কাছে পিতা তাঁহার ছোটো ক্যাশ বাক্সটি রাখিবার ভার দিয়েছিলে।"[৪১]

এছাড়া তিনি বালক রবিকে 'ঋজু পাঠ দ্বিতীয় ভাগ' (বিদ্যাসাগর), 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'(বিদ্যাসাগর), Richard A. proctor ,এর 'Myth and Marvels of Astronomy' এবং মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়েছিলেন। পাশাপাশি চিঠি পাঠের ভিতর দিয়ে চিঠি লেখার কলাকৌশল বিষয়গুলিও দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া পর্বতের স্বচ্ছ আকাশের তারাদের সাথে পরিচয় করাতে করাতে চলত জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা। শৃঙ্খলার দিকেও দেবেন্দ্রনাথ কঠোর ছিলেন। রাত্রির অন্ধকার দূর না হতেই সংস্কৃত পড়ার জন্য তুলে দিতেন বালক রবিকে। দাঁড়িয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করতে হতো। সময় মত দুধ খেতে হতো, যা রবীন্দ্রনাথের একেবারেই প্রিয় ছিল না। তবে, বেড়ানোর সময় কোন বাধা ছিল না। লোহফলক বিশিষ্ট লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়তেন বিস্তীর্ণ কেলুবনে। এভাবেই এক হতাশ বালক রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহ দিয়ে নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। হয়তো এই 'হতাশ' বালকের মধ্যে তিনি নিজেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। কারণ তিনি নিজেও সেকালের সম্ভ্রান্ত ঘরের রীতি মেনে নেয়া অন্তঃপুরের মধ্যেই বাল্য জীবন কাটিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই 'ক্যাশ বাক্স' সামলানো বালকের উপরেই পরবর্তীকালে জমিদারি সামলানোর দায়িত্ব ভার পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যে সেক্ষেত্রেও সফল হয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মধর্ম প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে জমিদারিতে বিশেষ মন দিতে পারেননি। পাবনার প্রজাবিদ্রোহ জমিদার হিসেবে তার বিফলতার প্রমাণ করে। অপরদিকে, রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের কল্যাণের কথাও মাথায় রেখেছিলেন। স্থাপন করেছিলেন পাতিসর কৃষি ব্যাংক (১৯০৫ খ্রি.) রবীন্দ্রনাথের উপর দেবেন্দ্রনাথের ভরসা ছিল। কাদম্বরী দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের হয়ে ওঠার পেছনেও দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা যথেষ্ট ছিল। তাই মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষ্যে প্রার্থনাতে রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেছিলেন –

> "পিতা মাতার স্নেহ প্রতিদান প্রত্যাশার অতীত। ...তাহা শিশু কাল হইতে আমাদিগকে হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য কেহ কখনো চাহে নাই। পিতৃস্নেহের সেই অযাচিত সেই পর্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি।"[৪২]

এক্ষেত্রে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যটি দেবেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার 'নিঃসঙ্গতা'কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতে সমস্ত আত্মীয় পরিজনের মাঝে তিনি ছিলেন তেমনি একা যেমন একা সৌর পরিবারের সূর্য। দেবেন্দ্রনাথের বিষয় কর্মের প্রতি ঔদাসীন্য ও অনাশক্তিতে দ্বারকানাথ বিরক্ত হতেন কারণ দ্বারকানাথ নিজে এক জাত উদ্যোগপতি (Entrepreneur) কিন্তু দ্বারকানাথের মৃত্যু পরবর্তী ব্যবসাজনিত ভাগ্য বিপর্যয়ের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ পিতা দেবেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> “যাহারা অপর্যাপ্ত ধনসম্পদ ও বাধাহীন ভোগসুখের মধ্যে মানুষ হইয়া ওঠে, দুঃখ সংঘাতের অভাব-বিলাস-লালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে যাহাতে শক্তি চর্চা অসম্পূর্ণ, সংকটের সময় তাহাদের মতো অসহায় কে আছে!”[৪৩]

তবু দেবেন্দ্রনাথ অবশিষ্ট সম্পত্তি সঠিক ভাবেই রক্ষণাবেক্ষণ ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। দেবেন্দ্রনাথ একাধারে তত্ত্বরঞ্জিনী সভা (পরিবর্তিত নাম তত্ত্ববোধিনী সভা) স্থাপন করেছেন অপরদিকে আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রভৃতি মিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং হিন্দু বিদ্বেষ প্রতিহত করতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (জুন ১৮৪০ খ্রি.) ও চিৎপুর রোডে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বৈঠক বাড়িতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। অবশ্য শেষেরটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ভূগোলের শিক্ষক অক্ষয় কুমার দত্তকে সম্পাদক করে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশ করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ পণ্ডিতরা বিভিন্ন সময় প্রবন্ধ নির্বাচনের দায়িত্ব সামলেছেন। পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারেও দেবেন্দ্রনাথ খেয়াল রাখতেন। সৌদামিনী দেবীর ভাষা ও বানানের হাল দেখে বেতন সাহেবের নব প্রতিষ্ঠিত ‘ক্যালকাটা ফিমেল’ স্কুলে ভর্তি করে দেন। প্রায় একই রকম ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’র ‘বাংলা শিক্ষার অবসান’ অধ্যায়ে। সত্যপ্রসাদের গৌড়ীয় ভাষার অনিন্দনীয় রীতির বাক্যবিন্যাস শুনে দেবেন্দ্রনাথ গৃহ শিক্ষক নীলকমল বাবুকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী কেশবচন্দ্র সেন ‘ব্রাহ্মসমাজে’ যোগ দিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় তৈরি হলো ‘ব্রাহ্ম বিদ্যালয়’ (১৮৫৯) ইতিমধ্যে ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ বিলোপের ফলে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র দায়িত্বও ব্রাহ্ম সমাজের হাতে অর্পিত হল। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক গঠনতন্ত্র, উপবীত বর্জন, ব্রহ্ম নেতাদের বেদি গ্রহণ আধিকার, স্ত্রী-স্বাধীনতা জাতিভেদ দূরীকরণ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের মতো নব্য ব্রাহ্মদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মতপার্থক্য দেখা দিল। যার ফলে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ১১ নভেম্বর ১৮৬৬ সালে ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’ স্থাপন করলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই ঘটনায় মর্মান্তিক দুঃখ পান। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১বঙ্গাব্দ) বলেছিলেন-

> “তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়া ছিল, যখন ধর্মের স্বদেশী রূপ রক্ষা করাকে সে সংকীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত, যখন সে মনে করিয়েছিল বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থ ভাবে উদার্য রক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব সর্বভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিলেন--ইহাতে তাঁহার আনুবর্তী অসামান্য প্রতিভাবশালী ধর্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল।”[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তিনি এবং তাঁর পূর্ববর্তী আধুনিকপন্থীরা প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে অনেক বিরুদ্ধতা করলেও দেবেন্দ্রনাথ কখনো প্রতিবাদ করেননি। মতের মিল না হলে শাসন করে আনুবর্তী করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থের ‘হিমালয় যাত্রা’ অধ্যায়ে এ রকম একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ-

> “আমি আদি সমাজের সেক্রেটারি পদে নূতন নিযুক্ত হইয়াছি তখন পিতাকে পার্কস্ট্রিটের বাড়িতে গিয়া জানাইলাম যে, ‘আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যবর্ণের আচার্য বসেন না, ইহা আমার কাছে ভালো বোধ হয় না’। তিনি তখনই আমাকে বলিলেন, ‘বেশ তো যদি তুমি পার তো ইয়ার প্রতিকার করিয়ো’। যখন তাঁহার আদেশ পাইলাম তখন দেখিলাম প্রতিকারের শক্তি আমার নাই। আমি কেবল অসম্পূর্ণতা দেখিতে পারি কিন্তু পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে পারি না। লোক কোথায়। ঠিক লোককে আহ্বান করিব, এমন জোর কোথায়। ভাঙ্গিয়া সে জায়গায় কিছু গড়িব, এমন উপকরণ কই।”[৪৫]

অবশ্য সব ক্ষেত্রে পিতার কাছে অভিযোগ করতে পেরেছেন এমনটা নয়। যক্ষারোগের উপর অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর স্ত্রী সাহানা দেবীর বয়স মাত্র পনেরো। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় বিকৃত মস্তিষ্ক বীরেন্দ্রনাথের পরিবার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। পিত্রালয় থেকে পুনরায় বিয়ে (ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম বিরুদ্ধ) দেওয়ার চেষ্টা করায় দেবেন্দ্রনাথ সাহানা দেবীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য রবীন্দ্রনাথকে এলাবাদে পাঠালেন। রবীন্দ্রনাথ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইতি পূর্বে 'ত্যাগ' গল্পে ও 'বিদ্যাসাগর চরিত' গ্রন্থে বিধবা বিবাহের সমর্থন করেছেন। অথচ সেদিন পিতার বিরুদ্ধে যেতে পারেননি। পরবর্তী কালে লেখা 'পলাতকা'র কবিতাগুলি রচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এক প্রকারের 'কাব্যিক-প্রায়শ্চিত্ত' করলেন বলে মনে হয়।

চার

এবার আমরা রবীন্দ্র দৃষ্টিতে উনিশ শতকের আর এক সমাজ শিক্ষা সংস্কারক বিদ্যাসাগর সম্পর্কে জানার চেষ্ঠা করবো। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'শকুন্তলা', 'ঋজুপাঠ', এবং 'সংস্কৃত ব্যাকরণের 'উপক্রমণিকা', 'সীতার বনবাস', পাঠ করে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে আদি কবির প্রথম কবিতা – 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। জীবনস্মৃতির 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' অধ্যায়ে আমরা দেখি বিদ্যাসাগরের সাথে রবীন্দ্রনাথের একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। বাংলা ভাষার পরিভাষা তৈরি ও সবরকম উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলার সাহিত্যিকদের একত্র করে একটি পরিষৎ স্থাপনের কল্পনা করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সেই সভায় বিদ্যাসাগরকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাছে 'বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক' তথা একজন 'যথার্থ মানুষ'। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখা চারটি লেখা 'চারিত্রপূজা' তে স্থান পেয়েছে। এছাড়া 'ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়' নামে একটি কবিতাও লেখেন। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখা গুলি ঠাঁই পেয়েছে 'বিদ্যাসাগর চরিত' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ 'চারিত্রপূজা'র 'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে লিখেছিলেন,

> "বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতু স্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে।"[৪৬]

তিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সেতু বন্ধনের কাজটি করেছিলেন। স্বদেশের পোশাক পরে তিনি বিদেশের বিদ্যাকে খোলা মনে বরণ করেছিলেন। কলেজ থেকে বেরিয়েই বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে 'সংস্কৃত কলেজের' অ্যাসিস্টান্ট্ সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কলেজের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সাথে মতান্তর হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত কলেজের' সাহিত্য অধ্যাপক ও ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ওই কলেজের প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে থাকার সময় থেকেই সমাজ সংস্কারের কাজে নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের পৌরুষের প্রধান লক্ষণ হিসাবে, স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তির দিকটিকে তুলে ধরেছেন।[৪৭] পূর্বে সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণদের প্রবেশাধিকার ছিল। সকল বাধা অতিক্রম করে বিদ্যাসাগর সেখানে শূদ্রদের সংস্কৃত পড়ার সুযোগ করে দেন। রবীন্দ্রনাথ এই সাফল্যকে সেই সময়ের একটি 'ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ' বলে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> "বিদ্যাসাগর প্রথমত বেথুন–সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন, তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালি-মিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালি-বর্ষণের মধ্যে এই ব্রাক্ষণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজা বিধিসম্মত করিয়া লইলেন।"[৪৮]

তৎকালীন ধর্মান্ধ অজ্ঞ মানুষদের বোঝানোর জন্য ধর্মগ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া বিদ্যাসাগরের কাছে কোনো উপায় ছিল না। রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেয়েছিলেন 'মনুসংহিতা'তে কিন্তু বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থে বিধবা বিবাহের পক্ষে কোন শ্লোক পেলেন না। মনু বিধবাদের সর্বনাশে সিদ্ধহস্ত। তখন বিদ্যাসাগর পরাসর সংহিতার 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে....' শ্লোকটি উদ্ধার করে বিধবাবিবাহ কে শাস্ত্র সম্মত বলে ব্যাখা করলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "অনেকে বলবেন যে, তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষমাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্র বচনের প্রভাব নয়।"[৪৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সংস্কৃত কলেজের কাজ ছাড়ার পর বিদ্যাসাগর স্থাপন করলেন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশান। বাঙালির নিজের চেষ্টায়,নিজের অধীনে উচ্চশিক্ষার কলেজ এই প্রথম। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটির উন্নতির কাজে এবং দীন দরিদ্র রোগীর সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাসাগর চরিত' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগরের প্রাণনাশের চেষ্টাও হয়েছিল। এছাড়া তিনি তাঁর সমযোগ্য কোনো সহযোগী খুজে পাননি। এবং নিজস্ব ভাবধারা প্রচারের জন্য ভক্ত পরিমন্ডলও তৈরি করেননি।

পাঁচ

ডিরোজিও–র নব্যবঙ্গ আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের মদ ও নিষিদ্ধ মাংস ঘোর সমাজ বিরুদ্ধ কাজকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> "নব্যবঙ্গেরা প্রথম অবস্থায় গোরু খাইতে, এই সহজ উপায়ে ইংরেজ হইতে পারিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় আবিষ্কার করিল পূর্ব পুরুষরাও খাইতেন অতএব তাঁহারা য়ুরোপীয় অপেক্ষা সভ্যতায় ন্যূন ছিলেন না, সুতরাং আমরা ইংরাজের চেয়ে কম নহি। সম্প্রতি তৃতীয় অবস্থায় গোবর খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মনে মনে ইংরাজকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।"[৫০]

অপরদিকে রামকৃষ্ণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল মাত্র একবার, কলকাতার নন্দবাগানে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে। রবীন্দ্রনাথ নিজে কালীর বিভৎস রূপের সমর্থক ছিলেন না। তাই কালী রূপের ভিন্ন চিত্র আঁকলেন -

"ডান হাতে তোর খড়্গা জ্বলে, বাঁ হাতে করে শঙ্কাহরণ"
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র আগুনবরন।" [৫১]

বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার কালীপ্রচারকেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ পছন্দ করেননি। কিন্তু কোনো দিন বিরূপ মন্তব্য করেননি। রবীন্দ্রনাথের লেখায় খুব বেশি রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আসেনি। 'মালঞ্চ' উপ্যনাসে নীরজার দেওয়ালে রামকৃষ্ণ শুধুমাত্র ছবি হিসাবে স্থান পেয়েছেন। অবশ্য 'পথ ও পথেয়'তে অনেকের মধ্যে ঐক্যকে, ক্ষুদ্রতার মাঝে ভূমাকে প্রতিষ্টার ক্ষেত্রে রামমোহন, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকান্দ এবং শিবনারায়ণ স্বামীর ভূমিকা কে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন।[৫২] রামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইংরেজিতে একটি রামকৃষ্ণ বন্দনা ও লেখেন। যা পরবর্তী কালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে উক্ত বন্দনাটির একটি বাংলা অনুবাদও করে দেন--

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা
তোমার জীবনের অসীমের লীলা পথে
নতূন তীর্থ দেখা দিল এ জগতে
দেশ-বিদেশের প্রণাম-অনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।" [৫৩]

শ্যামানন্দ লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্য লহরী'র 'আভাসে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন– "স্বামী শ্যামানন্দ পদ্যচ্ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী রচনা করিয়াছেন, হইার যথার্থ মুল্য সরল ভক্তির। ভক্তেরা ইহা শ্রদ্ধা পূর্বক গ্রহন করিবেন সন্দেহ নাই।"[৫৪] রামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত 'রামকৃষ্ণ ভক্ত' ছিলেন না সেটা পরিষ্কার। রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী। ব্রহ্মসমাজে যাতায়াতের সময় বিবেকানন্দ রবীন্দ্র-সংগীতের শ্রোতা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত গুলি তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের চোখে বিবেকানন্দ একজন 'মহাত্মা' তথা 'মহাসাধক'। আর বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা 'লোকমাতা।' বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র কোনো লেখা না থাকলেও নানা লেখায় বার বার বিবেকান্দের প্রসঙ্গ এসেছে। 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন– "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।... তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[৫৫] ভারত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পথিকদের অনুসৃত ‘ঐক্যতত্ত্ব’ বা মিলনতত্ত্বে’র অনুসারী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের পক্ষে ছিলেন। পতিত, বঞ্চিত নিপীড়িত ভারতবাসীর প্রতি বিবেকানন্দের ভালোবাসাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। আর নিবেদিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভারের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধন যৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতা মন সেই অনন্য দুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এই জন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন...”[৫৬] ‘গোরা’ রচনার ক্ষেত্রে বিবেকান্দের প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। ‘গোরা’র ইংরেজি অনুবাদক উইলিয়াম উইনস্ট্যনলি পিয়ার্সনকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

> “you ask me what connection had the writing of Gora with Sister Nivedita she was our guest in shilida and trying to improvise a story according to her request. I gave her something which came very near to the plot of Gora. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won’t find it in Gora as it stands now-but I introduced it in my story which I told her in order to Drive the point deep into her mind”.[৫৭]

রবীন্দ্র গবেষক জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে,গোরাই বিবেকানন্দ। তবে, গোরা একটি উপন্যাসের চরিত্র। স্বাভাবিক ভাবে গোরা ও বিবেকানন্দকে অক্ষরে মেলানোর চেষ্টা অবান্তর।[৫৮] ১৯০৯ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে ‘মরণ’ শিরোনামায় প্রকাশিত ‘মরণ-মিলন’ কবিতাকে জগদীশ ভট্টাচার্য বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলে অনুমান করেছেন। তাঁর মতে, ‘বিবেকানন্দ – নিবেদিতার মৃত্যুতীর্ণ দিব্য- সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ শিব-উমার প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের, মনোভূমিতে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার আত্মিক সম্পর্কের যে-রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার প্রতীক হল তপস্বিনী উমার আর বীরেশ্বর শিবের দিব্যমিলন। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে নিবেদিতার চিত্তে যে-দুঃসহ শোকের উদয় হয়েছিল তাই হল ‘মরণ-মিলন’ কবিতার বিষয়ালম্বন। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে শিবের সঙ্গে উমার মিলনের তাৎপর্য এই সম্পর্ক কল্পনার মধ্যেই বিধৃত রয়েছে।”[৫৯]

ছয়

‘Religion of an Artist’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত তিনটি আন্দোলনের মধ্যে দ্বিতীয়টি বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে সংঘটিত সাহিত্যিক আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘First Pioneer in the literary revolution’[৬০] বলে উল্লেখ করেছেন। ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “রামমোহন রায় যখন পদ্য লিখতে বসে ছিলেন তখন তাঁকে নিয়ম হেঁকে হেঁকে কোদাল হাতে, রাস্তা বানাতে হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বঙ্কিমের কলমে যে গদ্য দেখা দিয়েছিল তাতে যতটা ছিল পিণ্ডতা, আকৃতি ততটা ছিল না। যেন ময়দা নিয়ে তাল পাকানো হচ্ছিল, লুচি বেলা হয় নি।...তার পরে বিদ্যাসাগর এই কাঁচা ভাষার চেহারার শ্রী ফুটিয়ে তুললেন। আমার মনে হয় তখন থেকে বাংলা গদ্যভাষায় রূপের আবির্ভাব হল। আশ্চর্য্যের বিষয় হল এই যে, যিনি ঈশ্বর গুপ্তের আসরে প্রথম হাত পাকাচ্ছিলেন অত্যন্ত আড়ষ্ট বাংলা ভাষায়, সেই ভাষারই বন্ধন-মোচন করেছিলেন সেই বঙ্কিম। তিনিই তাকে দিয়েছিলেন চলবার স্বাধীনতা।”[৬১] রবীন্দ্রনাথের মতে মধুসূদন ‘ধ্বনি হিল্লোলের’ প্রতি লক্ষ্য রেখে যে সব সংস্কৃত শব্দের নির্বাচন করেছিলেন তার তুলনায় বিদ্যাসাগর নির্বাচিত সংস্কৃত শব্দ গুলি বাংলা ভাষায় বেশি গ্রহণ যোগ্য হয়েছে। আবার গদ্যশৈলীর দিক থেকেও ঈশ্বর গুপ্তের তুলনায় বিদ্যাসাগরকে এগিয়ে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেই বিদ্যাসাগরের বইগুলির পাশাপাশি পড়েছেন অক্ষয়কুমার দত্তের ‘পদার্থবিদ্যা’, ‘চারুপাঠ’; রামগতি ন্যায়রত্নের ‘বস্তু বিদ্যা’, মধুসূদনের ‘মেঘনাদ বধকাব্য’; বিহারীলালের ‘বঙ্গসুন্দরী’। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র হিসেবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩ খ্রিঃ) প্রকাশ বাংলা গদ্য বিবর্তনের ইতিহাসে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ রাজেনন্দ্রলাল মিত্রের ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের ‘অবোধবন্ধু’ পত্রিকার সাথে পরিচিত হলেন। দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্বপ্ন প্রয়াণ’ এর হয়ে ওঠা দেখেছেন। ‘জ্ঞানাঙ্কুর’ পত্রিকায় প্রকাশিত ভুবনমোহিনী প্রতিভা (নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), ‘অবসর সরোজিনী’ (রাজকৃষ্ণ রায়), ‘দুঃখসঙ্গিনী’ (হরিশচন্দ্র নিয়োগী) কাব্যগ্রন্থ গুলিও পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ ভালো পড়ে শোনাতে পারতেন। আমসত্ত্ব পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি নতুন বৌঠানকে শোনাতে হত প্রতাপচন্দ্র ঘোষের উপন্যাস ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’। আর একটু

বেশি বয়সে হাতে পেলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২ খ্রিঃ)। এই পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে বিকাশের মূল পর্বে প্রবেশ করল। বঙ্গদর্শনের জনপ্রিয়তার আভাস মেলে 'ছেলেবেলা'র পাতায়– "তখন 'বঙ্গদর্শন'এর ধুম লেগেছে – সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মত আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা। 'বঙ্গদর্শন' এলে পাড়ায় দুপুরবেলায় কারো ঘুম থাকত না।"[৬২] সেই সময় বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ', চন্দ্রশেখর' পাঠক সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

চন্দ্রনাথ বসুর প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে মরকতকুঞ্জে যে বার্ষিক সম্মেলনী উৎসব হয়েছিল। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। সেদিন 'ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুক প্রফুল্ল মুখ গুম্ফধারী চাপকান পরিহিত' সকলের থেকে স্বতন্ত্র আত্মসমাহিত বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে রবীন্দ্রনাথ এবং তার আত্মীয় সঙ্গীরা কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গেলেও সংকোচে কথা বলতে পারতেন না। সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে দেখা হত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত....।"[৬৩] সঞ্জীবচন্দ্রের লেখাও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ পালামৌ ভ্রমণ বৃত্তান্তকে নিয়ে 'সঞ্জীবচন্দ্র' নামে সাধনা পত্রিকা (পৌষ ১৩০১) পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের 'কবিতা পুস্তক', 'রাজসিংহ' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' বই গুলির সমালোচনা লেখেন। 'একটি পুরাতন কথা' (ভারতী,অগ্র. ১২৯১) প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। ভারতী (পৌষ ১২৯১) পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় আর একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ 'কৈফিয়ত'। এছাড়া 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামে দুটি কবিতা ও দুটি প্রবন্ধ লেখেন। একটি প্রবন্ধ 'জীবনস্মৃতি' (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯)-র জন্য । অপরটি প্রথমে সাধনা পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩০১) বের হয়। পরে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে স্থান পায়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জমানদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি মৃত্তিকা ক্ষেপন করিয়া গিয়াছেন...।"[৬৪]

রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনার ক্ষেত্রে রামমোহন পথ প্রদর্শক ছিলেন। অপরদিকে, শাস্ত্র থেকে ইতিহাস উদ্ধারের মতো দুরূহ ভার একমাত্র বঙ্কিমের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল।[৬৫] তিনি বাঙালির 'ঐতিহাসিক স্মৃতি' সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে 'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় (অগ্র. ১২৮৭ বঙ্গাব্দ) আত্মবিস্মৃত বাঙালিকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন-

> "বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়...বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব সকলেই লিখিবে ...।"[৬৬]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কাজটি করে যেতে পারেননি, তার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিল ক্লাসের পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস আসলে ভারতবর্ষের নিশীথ কালের একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। বহিরাগতদের কাটাকাটি মারামারির মধ্য দিয়ে সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে প্রকৃত ভারতবর্ষ চাপা পড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ মহাভারত, বৌদ্ধপুরাণ গুলিকে শুধু মাত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে না দেখে, সাহিত্য ও ইতিহাস হিসাবে পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। একবার ইতিহাস লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্র 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' প্রবন্ধে দেশীয় ইতিহাস সমালোচনা ও সংকলনের জন্য একটি ঐতিহাসিক সভা স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সভা স্থাপনের ব্যাপারটি ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর জোর দিতে বলেছিলেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে ইতিহাস লেখা সম্ভব, তার উদাহরণ হিসাবে অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'ঐতিহাসিক চিত্রাবলী' (ঐতিহাসিক পত্রিকা) ও 'সিরাজদৌল্লা' (ইতিহাস গ্রন্থ)-র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ট প্রতিভা মধুসূদন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেননি। তবে বাল্যকালে 'ভারতী' (১২৮৪ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামের সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি বের হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে লেখাটিকে কোনো রচনা সংগ্রহে স্থান দেওয়া হয় নি। কাঁচা হাতে লেখা এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "...আমি অল্প বয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের অল্লরস কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা, যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অবলম্বন করিলাম।”[৬৭]

রবীন্দ্রনাথের লেখায় ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন বিশেষ স্থান না পেলেও ‘পরিচয়’ গ্রন্থের ‘আত্মপরিচয়’ প্রবন্ধে মধুসূদনের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথর লেখলেন “একদিন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্য সাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তখনকার অধিকাংশ বাঙালি পাঠকে উপহাস-পরিহাস করুক আর যাহাই করুক তথাপি মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য।[৬৮] ‘মেঘনাদবধ কাব্য’কে ‘অমর কাব্য’, ‘শ্রেষ্ঠ কাব্য’ হিসাবে স্বীকার করলেও বেশ কিছুদিন পর ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘সাহিত্য রূপ’ (বৈশাখ ১৩৩৫) ও ‘বিদ্যাসাগর স্মৃতি’ (পৌষ ১৩৪৬) প্রবন্ধ দুটিতে বললেন, ‘মেঘনাদবধকাব্য’ রচনার মাধ্যমে যে স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়েছিল তা পরবর্তী কালে কোনো সাহিত্যিক অনুসরণ করলেন না। কারণ হিসাবে ‘ধ্বনিহিল্লোলে’র দিকে খেয়াল রেখে সংস্কৃত অভিধান থেকে নতুন নতুন শব্দ নির্বাচন করে লেখায় প্রয়োগ করাকেই দায়ি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে মধু কবির আনুসৃত এই রীতি অবলম্বন করে লেখা মোটেও সহজ ছিলনা।

আধুনিক গীতিকাব্যের অগ্রদূত বিহারীলাল চক্রবর্তীর সাথে প্রথম প্ররিচয় ‘অবোধবন্ধু’র পাতায়। বিহারীলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে ঠাকুরবাড়িতেও যাতায়াত ছিল। রবীন্দ্রনাথ কৈশোর কালে বিহারীলালের কবিতার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর থেকেও বড় ভক্ত ছিলেন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। বিহারী কবির ‘স্বপ্ন প্রয়াণ’ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। সাহিত্যে প্রতি কাদম্বরী দেবীর অনুরাগের কথা রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’র সাহিত্যসঙ্গী’ অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন। কাদম্বরী দেবীর সাহিত্যচর্চার অন্যতম সঙ্গী ছিলেন বালক রবি। সেই সময় ‘আর্যদর্শন’ প্রত্রিকায় প্রকাশিত ‘সারদামঙ্গল’এর অনেকটাই কাদম্বরী দেবীর কণ্ঠস্থ ছিল। কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথকে রাগানোর জন্য বিহারীলালের প্রতিভার সাথে তুলনা করে তাঁর ‘কবিত্বশক্তি’ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করতেন। নতুন বউঠানকে প্রভাবিত (impress) করার জন্য বিহারীলালের মতো লেখার চেষ্টা করতেন বালক রবীন্দ্রনাথ। এই চেষ্টায় ‘বিহারী কবির ভক্ত পাঠিকাটি কীভাবে বাধা হয়ে দাঁড়াতেন তার বর্ণনা পাই ‘জীবনস্মৃতি’র ‘সাহিত্য সঙ্গী’ ও ‘ছেলেবেলা’র ১১ নং অধ্যায়ে। ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,“বিহারীবাবুর মতো কাব্য লিখব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন এই পর্যন্ত দৌড়িত। হয়তো কোনোদিন বা মনে করিয়া বসিতে পারতাম যে, তাঁহার মতোই কাব্য লিখেতেছি -কিন্তু এই গর্ব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারী কবির ভক্ত পাঠিকটি। তিনি সবর্দাই আমাকে এ কথাটি স্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে, ‘মন্দঃ কবি যশঃ প্রার্থী’ আমি গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্’।”[৬৯] কাদম্বরী বিহারীলালের জন্য একটি কার্পেটের আসন বুনে দিয়েছিলেন, কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার পর ভক্ত পাঠিকাটির কথা ভেবে ‘সারদামঙ্গলে’র পরিশিষ্ট হিসাবে ‘সাধের আসন’ লেখেন। ‘আধুনিক সাহিত্য’ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘বিহারীলাল’ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর কাব্য শিক্ষার চেষ্টা শুরু হয়েছিল ‘বঙ্গসুন্দরী’ ও ‘সারদা মঙ্গলের’ মাধ্যমে।

সমবয়সী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাথে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তখন কর্মসূত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের যাতায়াত ছিল শিলাইদহে। নিজে একজন বিলেত ফেরত ‘কৃষি বিজ্ঞানী’। রবীন্দ্রনাথকে তিনি শান্তিনিকেতনে আলু চাষের জন্য উৎসাহিত করেন। সেই সময় কৃষকরা আলু চাষ করতে জানত না। আলু খাওয়ারও তেমন প্রচলন হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের তত্ত্বধানে আলুর বীজ পোঁতা হল। কিন্তু ফলন বিশেষ হল না। রথীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “তারপর থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন আসতেন তাঁর সঙ্গে বাবা সাহিত্য-আলোচনাই করতেন।”[৭০] ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বিলেত ফেরত কবির ‘আর্যগাথা’ (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ সালের সাধনায় বইটির একটি রিভিউ লিখলেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ‘বিরহ’ প্রহসনটি দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করলেন। কিন্তু এই বন্ধুত্ব বেশি দিন টেকেনি। দ্বিজেন্দ্রলাল ‘একটি পুরাতন মাঝির গান’, ‘কাব্যের অভিব্যক্তি’, ‘কাব্যের উপভোগ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্র কবিতার দুর্বোধ্যতা বিষয়ে আলোকপাত করেন। রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার উত্তরে ‘বঙ্গদর্শনে’ লিখলেন, “আমার কোনো বিশেষ কবিতা ভালো কি মন্দ, তাহা সুবোধ কি দুবোধ, সে সম্বন্ধে যদি বা আমার বলিবার কিছু থাকে তাহা না বলিলেও চলে। ভালো কবিতা না লিখিতে পারাকে ঠিক অপরাধ বলিয়া ধরা যায় না।”[৭১] এরপর ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় ‘কাব্য নীতি’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানকে অশ্লীল ও ‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটকটিকে বললেন দুর্নীগ্রস্ত। এর উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ললিতকুমার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বন্দ্যোপাধ্যায়'রা অনেক প্রবন্ধ লিখলেন। 'আনন্দ বিদায়' (১৯৯২ খ্রি.) প্রহসনে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসলেন। যার উত্তরে প্রথম চৌধুরী 'সাহিত্যে চাবুক' প্রবন্ধটি লিখলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বিদেশে। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে দ্বিজেন্দ্রলালকে একটি চিঠি লেখেন। এর উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি চিঠি লিখতে বসেন, তাতে বিরোধ অবসানের সম্ভাবনা ইঙ্গিত ছিল বলে অনেকে অনুমান করেছেন। যদিও শেষ সন্ধিপত্রটি পাওয়া যায় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু (৩জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) পরবর্তী কালে দেবকুমার রায় চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' বইটির ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনও তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই। আর যাহা কিছু অঘটন ঘটিয়াছে তাহা মায়া মাত্র...।"[৭২]

ভাষা বিজ্ঞান ব্যাকারণ, শব্দতত্ত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে সুনীতিকুমারকে 'ভূগোলবিজ্ঞানী' এবং নিজেকে 'পায়ে-চলা পথের ভ্রমন কারী' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' রচনার সময় কাশিমবাজারের মহারাজা মণীচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কাছ থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর এক অভিধান প্রণেতা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সাথে 'culture' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়। যোগেশচন্দ্র 'কৃষ্টি' শব্দটি প্রয়োগ করতেন। রবীন্দ্রনাথ 'সংস্কৃতি' শব্দটির পক্ষে ছিলেন। সম্ভবত প্রথমদিকে 'সংস্কৃতি' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল না। সুনীতিকুমার এই শব্দটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কৃষ্টির শব্দটির বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী তে লিখলেন,

> "বৈদিক সাহিত্যে সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, তাতে শিল্প সম্বন্ধেও সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে। 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'।"[৭৩]

এর জবাবে 'প্রবাসী' পাত্রিকাতেই 'কৃষ্টি ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে অমরকোষ ও মেদিনীকোষের দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন।পরবর্তী কালে যোগেশচন্দ্র রায় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি শব্দের ব্যাখ্যা করে লিখলেন, "(১) দেহের সুখ বিধান যে কৃতির লক্ষ্য, তাহা সভ্যতা। সভ্যতা বাহ্য বিষয়ের। (২) যাদ্দারা মনের সুখ সাধন হয়, তাহা সংস্কৃতি। (৩) যাদ্দ্বারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কৃষ্টি।"[৭৪] অবশ্য পরবর্তীকালে 'সংস্কৃতি' শব্দটি বেশি জনপ্রিয়তা পায়।

সাত

'The Religion of an Artist' গ্রন্থে বর্ণিত তৃতীয় আন্দোলনটি ছিল জাতীয়তাবাদ (National) কেন্দ্রিক। বাল্যকালে 'হিন্দেমেলা' (১৮৬৭ খ্রি.), সঞ্জীবনী সভার (হামচুপামুহাফ্) মাধ্যমে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল রবীন্দ্র মননে। পরবর্তী কালে তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'Nationalism' এর মতো গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি 'মহাত্মা গান্ধী', 'মহাত্মাজির পুণ্যব্রত', 'অরবিন্দ ঘোষ' প্রভৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবন্ধও লেখেন। রাজনৈতিক বিষয়ে গান্ধিজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত পার্থক্য ছিল। যেমন-স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশি কাপড় বর্জন ও স্কুল কলেজ বর্জনকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেননি। এই মত বৈষম্য সত্ত্বেও তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ক্ষুন্ন হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'মহাত্মা গান্ধী' প্রবন্ধে লিখেছেন, "মহাত্মা নম্র অহিংসনীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্দিকে তাঁর জয় বিস্তীর্ণ হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, সম্পূর্ণ পারি বা না পারি, সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের অন্তরে ও আচরণে রিপু ও পাপের সংগ্রাম আছে, তা সত্ত্বেও পুণ্যের তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে সত্যব্রত মহাত্মার নিকটে।"[৭৫]

আট

বিজ্ঞান বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। 'বিশ্বপরিচয়' রচনার পাশাপাশি নিজস্ব চেষ্টায় তৈরি করলেন বেশ কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ। যৌবন কালেই জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিজ্ঞানীকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে নিয়মিত আসতেন জগদীশচন্দ্র। এই পর্বে বন্ধু জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে রচনা করছেন ছোটোগল্প। ছাপানোর আগে পড়ে শোনাচ্ছেন জগদীশচন্দ্রকে। কেম্ব্রিজের শিক্ষা শেষ করে ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত থাকেন জগদীশচন্দ্র। নিজেস্ব মৌলিক কাজও শুরু করেন। ওয়ারলেস বা রেডিয়ো

তরঙ্গ সৃষ্টি ও প্রক্ষেপণে তিনি সাফল্য পান। ১৯০০ থেকে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র ইউরোপে কাটান। বন্ধুর সাফল্যে গৌরবান্বিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্লাঘা অনুভব করেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে আর্থিক দিক থেকে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা' (১মাঘ, ১৩০৬) কবিতা সংকলনটি উৎসর্গ করেন বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে। পৌষ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকাতে প্রকাশিত 'জগদীশচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া -আসার দেনাপাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক।"[৭৬] আর এক বিজ্ঞানী সতেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন 'বিশ্বপরিচয়' বইটি। এছাড়া বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল মোট পাঁচবার। একাবার ১৯২৬ সালে এবং চারবার ১৯৩০ সালে। তবে, ১৯৩০ সালের ১৪ জুলাই এবং ১৯ অগাস্ট এর সাক্ষাৎকার দুটির সম্পূর্ণ রেকর্ড রয়েছে। দু-জনের আলোচনায় উঠে এসেছে সত্য ও সৌন্দর্য, universe of reality, বস্তুর গঠন হিউম্যান সাইকোলজি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত।

নয়

পরিশেষে বলা যায়, উনিশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোকপাত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যে শুধুমাত্র তাঁদের চিন্তা-ধারা, নীতি, আর্দশের আলোচনা করেছেন তাই নয় পাশাপাশি সমকালীন সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, জাতিয়তাবোধ ও বিজ্ঞানভাবনা বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। স্বাভাবিকভাবে, উনিশ শতক সম্পর্ক জানতে হলে রবীন্দ্র-চর্চা অপরিহার্য।

Reference:

১. ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি,* দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ডিসে. ২০১৫, পৃ. ৫৫-৫৬

২. "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণকে পরবর্তী কালের ভারতব্যাপী জাতীয় জাগরণের প্রস্তুতিপর্ব বলা যেতে পারে। এই প্রস্তুতি-পর্বটিকে আবার মো টামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি ১৮১৭ থেকে ১৮৫৭: হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মহাবিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) পর্যন্ত; দ্বিতীয়টি মহাবিদ্রোহ থেকে স্বদেশি আন্দোলন: এই আন্দোলনের (১৯০৫-১১) মধ্যে আমরা দেখতে পাই বাংলার জাগরনের পূর্ণ বিকশিত রূপ।" দ্র. কবিরাজ, নরহরি। "বাংলার জাগরণ : মার্কসীয় বিচার", *উনিশ শতকের বাংলার জাগরন : তর্ক ও বিতর্ক ,*নরহরি কবিরাজ (সম্পা.), কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৯খ্রি. (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ ১৩৭

৩. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণের তৃতীয় মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিশিং প্রা.লি., ২০০৯খ্রি., পৃ. ১৪৮

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ "ব্যক্তি প্রসঙ্গ ৪", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* পঞ্চাদশ খণ্ড : খ (বিবিধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ২০০৪, পৃ. ৮৬২

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ভারত পথিক রামমোহন রায়,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, অগ্র. ১৩৭৯, পৃ. ৪২

৬. তদেব, পৃ. ১৮

৭. শীল, ব্রজেন্দ্রনাথ, *রামমোহন রায় ,*প্রথম সংস্করণ, চিরয়াত প্রকাশন, অগাস্ট ২০১৭, পৃ. ৬

৮. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণের তৃতীয় মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিশিং প্রা.লি., ২০০৯খ্রি, পৃ. ৩৯

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ভারত পথিক রামমোহন রায়,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, অগ্র. ১৩৭৯, পৃ. ৭৭

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "বিদ্যাসাগর", *রবীন্দ্র রচনাবলী,* একত্রিংস খণ্ড, বিশ্বভারতী ,৭ পৌষ ১৪০৭, পৃ. ৮৮

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী,* দশম খণ্ড (প্রবন্ধ),পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ২১৬

১২. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণের তৃতীয় মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিশিং প্রা.লি., ২০০৯খ্রি., পৃ. ৩৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আষাঢ় ১৩৯৪, পৃ. ৭৮-৭৯

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সঞ্চয়, রবীন্দ্র রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড (প্রবন্ধ),পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রু. ১৯৯২, পৃ. ৯৬০

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ভারত পথিক রামমোহন রায়,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, অগ্র.১৩৭৯, পৃ. ৪৩

১৬. তদেব, পৃ. ৪২

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চারিত্র পূজা, রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী,* একাদশ খণ্ড (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অগাস্ট ১৯৮৯,পৃ. ২০৫

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিঠিপত্র,* চর্তুদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ২২ শ্রাবণ ১৪০৭, পৃ. ৭৩

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি,* বারিদবরণ ঘোষ(সম্পা.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., নভে ২০১৬ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ৫৩

২০. কৃপালনী, কৃষ্ণ, *দ্বারকনাথ ঠাকুর : বিস্মৃত পথিকৃৎ,* ক্ষিতীশ রায় (অনু.), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০৭ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ২৭৭

২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ভারত পথিক রামমোহন রায়,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, অগ্র ১৩৭৯, পৃ. ২০

২২. তদেব, পৃ. ২৮

২৩. তদেব, পৃ. ৩২

২৪. তদেব, পৃ. ৪৩

২৫. তদেব, পৃ. ৬১

২৬. তদেব, পৃ. ৯০

২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, “রাজা রামমোহন রায়”, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড (কবিতা), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১২৯১

২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ভারত পথিক রামমোহন রায়,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, অগ্র. ১৩৭৯, পৃ. ৭৯

২৯. রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে জানতেন দ্বারকানাথ ইংরেজ সরকারের সাথে আফিম ব্যবসাতে যুক্ত থাকার কথা? অথচ রবীন্দ্রনাথের ‘চীনে মরণের ব্যবসায়’ এই ‘হীন ব্যবসায়’ নিন্দা করলেও দ্বারকানাথের প্রসঙ্গ তোলেননি!

৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ভারত পথিক রামমোহন রায়,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, অগ্র. পৃ. ৭৭

৩১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০, পৃ. ৭৮৯

৩২. মুখোপাধ্যায়, তরুণ, “রবীন্দ্র দৃষ্টিতে রামমোহন রায় : এক ভ্রান্ত মূল্যায়ন’, *অ,* শতরূপা সান্যাল(সম্পা.), তৃতীয় বর্ষ(প্রথম সংখ্যা), অগাস্ট ১৯৮৩, পৃ. ৮

৩৩. Tagore, Rabdindranath. “The religion of an artist.” *The English Writings of Rabindranath Tagore,* Sisir Kuamar Das (Ed.), Vol III (A Miscellany), Sahitya Akademi, p. 683

৩৪. তদেব, পৃ. ৬৮২

৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি,* বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি, নভে. ২০১৬(চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ১২

৩৬. তদেব, পৃ. ৬৭

৩৭. তদেব, পৃ. ৬৯

৩৮. তদেব, পৃ. ৭০

৩৯. তদেব, পৃ. ৭০

৪০. তদেব, পৃ. ৭২

৪১. তদেব, পৃ. ৭৩

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চারিত্র পূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী,* একাদশ খণ্ড (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অগাস্ট ১৯৮৯ পৃ. ২০৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪৩. তদেব, পৃ. ২০৫
৪৪. তদেব, পৃ. ২০৩
৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি, নভে. ২০১৬ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ৭৫
৪৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চারিত্র পূজা, রবীন্দ্রনাথ-রচনাবলী,* একাদশ খণ্ড (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অগাস্ট ১৯৮৯, পৃ. ২১৪
৪৭. তদেব, পৃ. ১৮০
৪৮. তদেব, পৃ. ১৮০
৪৯. তদেব, পৃ. ২১৬
৫০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "নব্যবঙ্গের আন্দোলন", রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৪০৪, ত্রিংশ খণ্ড, পৃ. ২৪৩
৫১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড (গান), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮৭, পৃ. ২৬৬
৫২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রাজাপ্রজা, রবীন্দ্র রচনাবলী,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নভে. ১৯৯০, ত্রয়োদশ খণ্ড (প্রবন্ধ) পৃ. ২৩৪।
৫৩. মুখোপাধ্যায়, প্রণতি ও অভীককুমার দে (সম্পা.), *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : মাসিক বসুমতী*। প্রথম সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, ৮ অগাস্ট ২০১৩, পৃ. ৬৪
৫৪. শ্যামানন্দ, "আভাস", *শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্য লহরী,* বর্ম্মা আর্ট প্রেস লিমিটেড, [প্রকাশ কালের উল্লেখ নেই], পৃ. (তবতরণিকার পূর্বের পৃষ্ঠা)
৫৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।*সমাজ*। *রবীন্দ্র- রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার,নভে. ১৯৯০, পৃ. ৪২৩।
৫৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "ভগিনী নিবেদিতা", *পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নভে. ১৯৯০, পৃ. ৫৩৮
৫৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিঠিপত্র,* ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ফেব্রু. ১৯৯৩, পৃ. ২০৬
৫৮. ভট্টাচার্য, জগদীশ, "গোরা ও বিবেকানন্দ", *জগদীশ ভট্টাচার্যের অগ্রন্থিত গদ্য,* তপব্রোত ঘোষ (সংকলন ও বিন্যাস), প্রথম সংস্করণ, ভারবি, ২৮জানু. ২০১২, পৃ. ১৫৬
৫৯. ভট্টাচার্য, জগদীশ, বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। ভারবি, জানু.২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৪০-৪১
৬০. Tagore, Rabindranath. "Religion of an Artist." The English Writings of Rabindranath Tagore, Sisir Kumar Das (Ed.), Vol- III (A Miscellany), Sahitya Akademi, p.683
৬১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বাংলা ভাষা পরিচয়', দ্র. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ১৯৮৯, দশম খণ্ড (প্রবন্ধ), পৃ. ১০৩৪- ১০৩৫
৬২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ছেলেবেলা, রবীন্দ্র রচনাবলী,* একাদশ খন্ড (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অগাস্ট ১৯৮৯, পৃ. ১১৫
৬৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি,* বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., নভে. ২০১৬ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ২১৬
৬৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* দশম খন্ড (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ২১৬
৬৫. তদেব, পৃ. ২১৬
৬৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, "বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটা কথা",*বঙ্কিম রচনাবলী,* প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, দোল পূর্ণিমা ১৩৬১, পৃ. ৩৩৭
৬৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., নভে. ২০১৬ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ১৩০
৬৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "আত্মপরিচয়", *পরিচয়*। *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নভে. ১৯৯০, পৃ. ৫১৪

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 373 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., নভে. ২০১৬ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ১৯১

৭০. ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ, "শিলাইদহের স্মৃতি", *বসুধারা*, বৈশাখ ১৩৬৭. পৃ. ১৩

৭১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য", *রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক*, পুলিনবিহারী সেন (সংকলক) ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ অগাস্ট, ১৯৯৯, পৃ. ৩৭

৭২. চৌধুরী, দেবকুমার, *দ্বিজেন্দ্রলাল*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কুন্তলীন প্রেস, ১৩২৮, পৃ. ভূমিকা অংশ

৭৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "কালচার ও সংস্কৃতি", *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৌষ ১৪০২, পৃ. ২০৮

৭৪. রায় [বিদ্যানিধি], যোগেশচন্দ্র, *বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল*, প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬১, পৃ/০ (ভূমিকা অংশ)

৭৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চারিত্র পূজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অগাস্ট ১৯৮৯, পৃ. ২৭৪

৭৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "জগদীশচন্দ্র", *ব্যক্তিপ্রসঙ্গ, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চাদশ খণ্ড : খ (বিবিধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ২০০৪, পৃ. ৯১১